২.৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২.৫.১ সাধারণ পরিচয়

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্য শাসন করেছেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম। ছোটগল্প ও উপন্যাস দু-ধরনের প্রকরণেই তাঁর সমান স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও তুলনামূলকভাবে উপন্যাসগুলিই তাঁর বেশি সমর্থ এবং জনপ্রিয়। দীর্ঘকাল ধরে উপন্যাস লিখেছেন, বলা যেতে পারে আমৃত্যু এবং সেইসব উপন্যাস পর্ব পর্বান্তরে স্বাদ বদল করেছে বলে উপন্যাসগুলির আলোচনা পর্বভিত্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে সেইভাবে পর্বগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার আগে ঔপনাসিক হিসাবে তাঁর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি জেনে রাখা প্রয়োজন।

ক. উপন্যাস রচনায় তারাশঙ্করের একটা ধ্রুপদী বা ক্লাসিক আদর্শ ছিল মনে করাই ভালো। অর্থাৎ আধুনিক সময়ের উপযোগী হবার জন্য সমসাময়িক বিপর্যয়ের চিত্রগুলি উপন্যাসে উপস্থাপনের প্রয়োজন তিনি বোধ

Scanned with CamScanner

করেননি। জীবন সম্বন্ধে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন। উপন্যাসের কলেবর অনেক সময়ই দীর্ঘ হয়ে পড়েছে, সে বিষয়ে ভাবিত হবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেছেন বলে মনে হয়না। নিজে গান্ধীবাদী রাজনীতি করতেন, উপন্যাসে তার প্রভাবও খুব গভীরভাবে পড়েছে বলে মনে হয়না।

খ. তারাশঙ্করকে অনেকেই আঞ্চলিক উপন্যাসের পথিকৃৎ মনে করে, কারণ রাঢ়ের একটি বিশেষ অঞ্চলকে অবলম্বন করেই তিনি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন, এর মধ্যে পরিপূরক-ত্রয়ী বা ট্রিলজি উপন্যাসও এমনভাবে এঁকেছেন যে, সমগ্র রাঢ় অঞ্চলই তাঁর কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

গ. আঞ্চলিক মানুষের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করার জন্য তাদের মুখের আঞ্চলিক ভাষাও তারাশঙ্কর গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে, অর্থাৎ এই ভাষা বৃহত্তর পাঠক-সাধারণের বোধগম্য হবে কি না, এ সম্বন্ধে কিছুটা দ্বিধা ও অস্বস্তি তারাশঙ্করের ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে সমর্থন পেয়ে এ বিষয়ে সংশয় তাঁর দূর হয় এবং অসংকোচে এই ভাষা তিনি ব্যবহার করতে থাকেন। অবশ্য উত্তরপর্বে তাঁর উপন্যাস যখন বেশিরভাগই নগরকেন্দ্রিক হয়ে আসে, তখন আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন তাঁর আর ঘটে নি।

২.৫.২ তারাশঙ্করের উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ

তারাশঙ্করের রচিত উপন্যাস উৎকর্ষে বড় তো বটেই, কিন্তু পরিমাণেও নিতান্ত কম নয়। বিষয়বৈচিত্র্যও উল্লেখ করার মতো। সুতরাং পর্ব-অনুযায়ী তাদের খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে গেলে পর্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আমরা মোটামুটি তিনটি পর্বে তাঁর উপন্যাসগুলি বিন্যস্ত করতে পারি :

ক. উন্মেষ পর্ব

খ. ধ্রুপদী পর্ব

গ. আধুনিক পর্ব

উন্মেষ পর্বে আমরা চৈতালি ঘূর্ণি, রাইকমল প্রভৃতি সেইসব উপন্যাসকে স্থান দিতে পারি যেগুলি আয়তনে বিশেষ বড় নয়, কোনো-কোনোটিকে বড় গল্প আখ্যা দেওয়াও অসম্ভব নয়। দীর্ঘ উপন্যাসের বীজ এদের মধ্যে নিহিত থাকলেও সম্ভবত প্রাথমিক প্রয়াস বলেই এদের আয়তন দীর্ঘ করা হয়নি। দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসের জন্যই তারাশঙ্করের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা বেশি, এগুলি তাঁর স্বাতন্ত্র্যেও বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত বলা যায়। ধ্রুপদী রীতিতে রচিত বলেই এদের আয়তন নিয়ে তারাশঙ্করকে বিশেষ চিন্তা করতে হয় নি। আজ পর্যন্ত তারাশঙ্করের পরিচয়বাহী উপন্যাস বলতে এগুলিরই নাম করতে হয়। এদের মধ্যে আছে ধাত্রীদেবতা, কবি, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা প্রভৃতি উপন্যাস। তৃতীয়পর্বের উপন্যাসে তারাশঙ্কর শহরমুখী হয়েছেন। সামন্ততন্ত্র, গ্রামীণ অর্থনীতির বিপর্যয়, পল্লীসংস্কৃতির হ্রাসপ্রাপ্তি ইত্যাদির বদলে শহর ও নাগরিক সমস্যাকে তিনি বেছে নিয়েছেন। এই পর্বের উপন্যাসের মধ্যে পড়তে পারে বিচারক, সপ্তপদী, মঞ্জুরী অপেরা প্রভৃতি।

২.৫.৩ তারাশঙ্করের উপন্যাসের পরিচয়

ক তারাশঙ্করের উন্মেষ পর্বের উপন্যাসে একদিকে আমরা দেখি শরৎচন্দ্রীয় উত্তরাধিকার নিম্নবিত্ত সংসারের পারিবারিক সমস্যা, অন্যদিকে অবক্ষয়িত বৈষ্ণব সমাজের চিত্র। 'নীলকণ্ঠ' (১৯৩৩) উপন্যাসে নাটকীয় ঘটনা খুব বেশি। সচ্ছল কৃষক পরিবারের কর্তা শ্রীমন্ত একটি অযোগ্যপাত্রের হাতে নিজের ভাগিনেয়ীকে সমর্পণের চেষ্টা প্রতিহত করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত কারাবরণ করেছে। শ্রীমন্তর কারাবাসে স্বাধীনচেতা গিরির অবস্থা হয়েছে করুণ। দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের অভিঘাতে ক্লান্ত গিরি স্বামীর বন্ধু বিপিনের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামের গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু পিতৃপরিচয়হীন অনাথ সন্তান নীলকণ্ঠ আশ্রয় পেয়েছে শ্রীমন্তর কাছে।

Scanned with CamScanner

'রাইকমল' (১৯৩৪) উপন্যাসে তারাশঙ্করের বিশিষ্ট সৃষ্টিপ্রযত্নের একটি আভাস পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সমাজের রোমান্টিক আবহাওয়ায় এই উপন্যাস লালিত। বৈষ্ণব জীবনচর্যা, রাধাকৃষ্ণের সেবা, আশ্রমের পরিচর্যা, মাঝে মাঝে বৈষ্ণব পদাবলীর কলি এই উপন্যাসে এমন এক ধরনের মাদকতার সৃষ্টি করে যে কাহিনিভাগের বিশ্বাসযোগ্যতা—রসিকদাসের সঙ্গে রাইকমলের বিবাহ আদৌ বিশ্বাস্য কিনা, এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগেনা।

বরং তুলনামূলক ভাবে প্রথম পর্বে রচিত 'পাষাণপুরী' উপন্যাসটি অনেক উন্নতমানের। পরবর্তীকালে জরাসন্ধ কারাগারকে অবলম্বন করে যেসব জনপ্রিয় উপন্যাস রচনা করেন, এটিকে তার সূচনা বলা হয়। কারাগারে অসুস্থ পরিবেশও মানবমহিমার জয়গাথা এর মূল অবলম্বন। নরুর জীবনাদর্শ পাতালপুরীকে স্বর্গলোকে পরিণত করেছে, কিন্তু বলা বাহুল্য এই পরিবেশ ক্ষণস্থায়ীই হয়, চিরস্থায়ী হতে পারে না।

প্রথম পর্বের উপন্যাসের মধ্যে 'আগুন'-এর নামও করতে হবে, কারণ অরণ্যপ্রকৃতির ওপর যন্ত্রশক্তির প্রাধান্য, ভেতরে ভেতরে প্রাচীন প্রথার সুনিশ্চিত অবলুপ্তি জেনেও তার প্রতি মমত্ববোধ ইত্যাদি লেখকের বিশিষ্ট মানসিকতা এখানে প্রকাশিত।

খ. তারাশঙ্করের উন্মেষপর্বের কালসীমা যদি ধরি 'আগুন' উপন্যাসের অর্থাৎ ১৯৩৭ সাল, বা তার একবছর পরে, তবে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাস থেকেই তারাশঙ্করের মূল রচনাপর্বের কালসীমা শুরু হবে। মোটামুটিভাবে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। এর মধ্যেই তারাশঙ্কর তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি রচনা করেন। এগুলি হল—'ধাত্রী দেবতা' (১৯৩৯), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪) 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'মন্বন্তর' (১৯৪৪) 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), 'কবি' প্রভৃতি। 'আগুন' উপন্যাসে যার সূচনা, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রশক্তির সাহায্যপুষ্ট নবোদ্ভূত ধনতান্ত্রিক সমাজের সংঘর্ষ, বিলীয়মান পল্লীসংস্কৃতি, রাঢ়ের সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রা—এই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনাই এই পর্বের উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন। অবশ্য তাই বলে ব্যক্তিগত সমস্যাও যে একেবারেই নেই, সে কথা বলা যাবে না।

ধাত্রীদেবতা-গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম উপন্যাস তিনটিকে একটি ট্রিলজি বলাই ভালো। রাঢ়ের জীবনযাপন প্রণালী, মানুষের মূল্যবোধ, পর্বান্তরের সূচনা—সবকিছুই যেন সামগ্রিক ভাব ধরা হয়েছে এখানে। প্রথম দুটি উপন্যাসে পাই জমিদার গোষ্ঠীর সংস্কারলালিত জীবনে আধুনিক চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ এবং তৃতীয় উপন্যাসে পাই রাঢ়ের সাধারণ মানুষের জীবনে জটিল সমস্যা উদ্ভব। 'ধাত্রীদেবতা'য় জমিদার সন্তান শিবনাথের যৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত কালসীমা বর্ণিত হয়েছে। স্নেহময়ী ও কোমলস্বভাবের মা এবং 'জমি বাপের নয়, দাপের', এ কথা যিনি বলেন, সেই জমিদারি মেজাজের পিসিমা—এই দুই নারী ব্যক্তিত্বের টানাপোড়েনে চরিত্রটি গঠিত। সেইসঙ্গে সমসাময়িক রাজনীতি, সন্ত্রাসবাদ ও অসহযোগ আন্দোলনও তাকে প্রভাবিত করে। 'গণদেবতা'-য় পাই আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনি। আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাবে গ্রাম্য অর্থনীতির বিপর্যয় এবং গ্রামীণ আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির অবলুপ্তি এই উপন্যাসের বিষয়। জমিদার দ্বারিক চৌধুরী নেমে এসেছেন সাধারণ কৃষকের পর্যায়ে। বিত্তের প্রভাবে বর্ণ কৌলীন্য লাভ করতে চাওয়ার দৃষ্টান্ত ছিরু পাল—সে শ্রীহরি পাল হিসাবে জাহির করে নিজেকে। দেবু পণ্ডিত গ্রামে নতুন এক আদর্শের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে, কিন্তু গ্রামের বিলম্বিত লয়ের জীবনচর্যায় তা ছন্দপতন বলেই মনে হবে। আর এক স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরের ন্যায়রত্ন, যদিও উপন্যাসে তাঁর কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই। কাহিনীর পূর্বানুবৃত্তি বরং আছে 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে। ত্রয়ী উপন্যাসের মধ্যে এটিকেই সব চেয়ে সার্থক বলা উচিত। এই উপন্যাসে কাহিনি যদিও মাঝে মাঝে অতিনাটকীয় হয়ে পড়েছে, চরিত্রগুলির পরিণতি একেবারে সঠিক, বিশেষত দেবু পণ্ডিত অর্থাৎ দেবু ঘোষ।

'কালিন্দী' উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে খুব অভিনবত্ব নেই, ক্ষয়িষ্ণু জমিদারশ্রেণির সঙ্গে ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতিভূ বিমল মুখার্জির সংঘাত এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পূর্বাভাস। হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'-য় প্রাচীন লোকসংস্কারাশ্রিত জীবনের প্রতিভূ

Scanned with CamScanner

বনোয়ারি এবং আধুনিক কালের মানুষ করালীচরণ। এই দু'জন বা দুটি জীবন্তদৃষ্টি সংঘাতই উপন্যাসের অবলম্বন। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'-র অবলম্বনও অনেকটা তাই। বরং 'কবি' উপন্যাসে সংঘাতের চেয়ে গ্রাম্য কবিগান এবং ঝুমুর গোষ্ঠীর জীবনযাপন প্রণালীই অনেক প্রাধান্য পেয়েছে। কিছুটা ব্যক্তিগত সমস্যাও এখানে উঠে এসেছে। 'জীবন এত ছোট কেনে' এবং 'ভালোবেসে মিটিলনা সাধ'—এই দু'টি গানই হল এই উপন্যাসের নির্যাস।

তারাশঙ্করের তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাসের সূচনা হিসাবে আমরা ধরেছি 'আরোগ্য নিকেতন' (১৩৫৯)। এটি অবশ্য নাগরিক উপন্যাস নয়, কিন্তু প্রাচীনপন্থী কবিরাজ জীবন মশায়ের সঙ্গে আধুনিক ডাক্তারের সঙ্গত এখানে নিশ্চয়ই আমরা দেখতে পাই। সেই হিসাবে একে আধুনিক সমস্যাই বলব আমরা। অন্তত গোষ্ঠী ছেড়ে ব্যক্তিক সমস্যার বৃত্তে যে নেমে এসেছেন তারাশঙ্কর, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রত্যেকটি উপন্যাসই অত্যন্ত জনপ্রিয়, তাই পৃথকভাবে আলোচনা করে লাভ নেই, শুধু বলা যায়, আধুনিক জাটিল মনস্তত্ত্ব নির্ভর করে লিখেছেন বিচারক (১৯৫৬), ধর্মীয় সংস্কার ও প্রেম-মনস্তত্ত্বের নিপুণ মিশ্রণে লিখেছেন 'সপ্তপদী' (১৯৫৭), একটি বিশেষ সময়ের বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনকে অবলম্বন করে লিখেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাধা' (১৯৫৮), ওই একই সালে লেখা যুদ্ধের পটভূমিকায় বিচিত্র প্রেমোপাখ্যান 'উত্তরায়ণ'। এ ছাড়াও 'মহাশ্বেতা' (১৯৬০), যোগভ্রষ্ট (১৯৬০) প্রভৃতি তাঁর শেষ পর্বের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

তারাশঙ্করের উত্তরপর্বের উপন্যাসে রাজনীতি প্রায়ই একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং কোনো কোনা ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক দৃষ্টি শিল্পকীর্তিকে আচ্ছন্ন করেছে।

২.৬ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

এমন একটি সময়ের বিভূতিভূষণের আবির্ভাব, বাংলা সাহিত্যকে যখন বলা চলে একটা প্রশ্ন চিহ্নের যুগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই স্থির ও ধ্রুববিশ্বাসে ফাটল ধরতে শুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথের আনন্দিত সৃষ্টি সমকালীন কল্লোলীয়দের খুশি করতে পারছিল না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মতো শিল্পীও নিটোল উপন্যাসসৃষ্টি থেকে শুরু করে বিরত ছিলেন। আসলে যে আস্তিক্য মনোভাব উপন্যাসশিল্পের জন্ম দিতে পারে, সেই মনোভাবই আজ সংশয়াচ্ছন্ন। সেই সময়ে বিভূতিভূষণের হাতে 'পথের পাঁচালি'-র মতো উপন্যাসের জন্ম একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

বিভূতিভূষণের মানসিকতার বৈশিষ্ট্য বিচার করতে গিয়ে বলা হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে দু-ধরনের ঔপন্যাসিক আছেন—(ক) জ্ঞানমার্গীয়, যাদের কাকপন্থী বলা যায় অর্থাৎ বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা যাঁরা জীবনের রূপ ফুটিয়ে তুলতে চান, (খ) আস্বাদনপন্থী বা কোকিলবৃত্তের লেখক, জীবনকে যাঁরা উপভোগ করতে চান। বিভূতিভূষণ এই দ্বিতীয় ধরনের লেখক।

ব্যক্তিগত জীবনে যিনি ছিলেন নিতান্ত সরল ও সাদাসিধা মানুষ, রচনাভঙ্গিও তাঁর আটপৌরে। ভঙ্গি দিয়ে চোখ না ভুলিয়ে অনুভূতির গভীরতা ও আন্তরিকতাতেই পাঠককে তিনি মুগ্ধ করেছেন। বিষয়ের বৈচিত্র্যও তাঁর উপন্যাসের একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য, তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য, প্রেম ও রোমান্স সৃষ্টিতে তাঁর খুব বেশি আগ্রহ দেখা যায় না, কিন্তু জীবনের সহজ সরল কাহিনিতে তিনি স্বাচ্ছন্দ এবং স্বভাবত সেই কারণেই তিনি বাংলা উপন্যাসের এক অতি জনপ্রিয় শিল্পী।

২.৬.১ বিভূতিভূষণের উপন্যাস

'পথের পাঁচালি' (১৯২৯) ও 'অপরাজিত' (১৯৩২) উপন্যাস নিয়ে বিভূতিভূষণের আত্মপ্রকাশ। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যখন অগ্নিগর্ভ, তখন নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের প্রশান্ত সরল জীবনের চিত্র আঁকা লেখকের পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক কিনা, এ প্রশ্ন কেউ কেউ তুলেছেন। এখানে আমাদের বক্তব্য

Scanned with CamScanner

অতি স্পষ্ট। গ্রামের বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও সুবিশাল দারিদ্র্যের ছবি বিভূতিভূষণ আঁকেননি বললে সত্যভাষণ করা হবে না। চরম বিপর্যয়ের ছবি তিনি এঁকেছেন, কিন্তু সমস্ত কাহিনিবৃত্তই একটি মুগ্ধ বালকের চোখে দেখা বলে তার মধ্যে এক বিস্ময়াবিষ্ট সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। লেখকের জীবনদৃষ্টিই এক জন্য দায়ী।

উপন্যাসদুটিকে আত্মজৈবনিকও কেউ কেউ মনে করেন। উপন্যাসের নায়ক অপু বা অপূর্ব বিভূতিভূষণেরই আত্মপ্রক্ষেপ বলে কারো কারো মনে হয়েছে। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করেছেন—'বল্লালী-বালাই', 'আম আঁটির ভেঁপু' এবং 'অক্রূর সংবাদ' (প্রথম নাম ছিল 'উড়ো পায়রা')। গ্রামীণ পরিবেশে বর্ধিত এক বিশেষ পরিবারের বিস্তৃত কালযাপনের বর্ণনা সূত্রে যেন লেখক জীবনপথের একটি ধারাবাহিক চিত্রই অঙ্কন করতে চেয়েছেন। পথের এই পাঁচালির প্রথমভাগে কৌলিন্যপ্রথার কুফল স্বরূপ ইন্দির ঠাকুরণের দুঃসহ জীবন, সেই জীবনের অবসানে যেন একটা যুগের সমাপ্তি। অতঃপর অপু-দুর্গার নির্মম দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বপ্নদেখার ও স্বপ্নালু দৃষ্টিতে জীবনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পাঠ দেখানো হয়েছে, তাই এর নাম আম আঁটির ভেঁপু। দুর্গার অকালপ্রয়াণে এই পর্বের সমাপ্তি এবং নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম ছেড়ে প্রবাস যাত্রায় অক্রূর সংবাদের সূচনা।

'পথের পাঁচালী'-র পথ যে সত্যই দীর্ঘ, নিশ্চিন্দিপুরের মতো ছোট একটি গ্রামের পথেই যে তা আবদ্ধ নয়, এ কথা উপন্যাস আরো অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বুঝতে পারি। প্রথমে কাশীর একেবারে অপরিচিত জীবন, জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে পরিচয়েরও সেই সূচনা। এরপর মনসাপোতার জীবন। মায়ের ইচ্ছা পৌরোহিত্যের জীবন, কিন্তু অপু তা গ্রহণ করেনি, পড়াশুনোর জীবনই সে গ্রহণ করেছে। এরপর তার কলকাতায় কলেজ জীবন নিশ্চিদ্র দারিদ্র্যের জীবন। মায়ের মৃত্যু এবং আকস্মিক বিবাহ তার জীবনে এরপর দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অপর্ণার মৃত্যুর পর অপুর দীর্ঘ প্রবাসজীবন যেন এই উপন্যাসের নামকরণের পরোক্ষ সমর্থন। পথের পরিক্রমা শেষ হয়েছে পুত্র কাজলকে নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে আসায়।

পথের পাঁচালী-অপরাজিত-য় অপু গ্রাম থেকে শহরে গিয়েছিল, 'আরণ্যকে' (১৯৩৯) সত্যচরণ শহর থেকে গ্রামে এল। দু'জনেই আসলে বিভূতিভূষণের ছদ্ম-আমি ছাড়া বিশেষ কেউ নয়। আরণ্যকে যে জগৎ আমরা দেখতে পাই সে জগতের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় ছিল না, সে দারিদ্রের সঙ্গেও নয়। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন এখানেও উঠবে। সত্যচরণ যে কাজে লবটুলিয়ার জঙ্গলে এসেছিল, তাকে নির্মম কাজ হিসাবেই অভিহিত করা যায়। নদীর গর্ভে বিলীন জমি আবার জেগে ওঠার পর সেখানে প্রজাপত্তন করা—অবশ্যই পুরনো প্রজার বদলে নতুন প্রজার সম্মান কারণ তাতে অর্থসংগ্রহ অনেক বেশি হবে। এই নিষ্ঠুর জমিদারি চালের পরিবর্তে এক মুগ্ধ প্রকৃতিবোধ যে উপন্যাসকে বাংলা সাহিত্যে প্রায় অনন্য করে রেখেছে, তার কারণ সত্যচরণের আদ্যন্ত নাগরিক চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে ব্যাপ্ত, বিশাল ও ভয়ংকর-সুন্দর আরণ্য প্রকৃতিকে।

'আরণ্যক' বিভূতিভূষণের চতুর্থ উপন্যাস। তৃতীয় উপন্যাস 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫) এবং পরে 'দেবযানে' প্রথম দুটি উপন্যাসের উন্নত মান লেখক বজায় রাখতে পারেন নি, এমন কথা অনেকে মনে করেন। এ দুটি উপন্যাসেই বিভূতিভূষণ এঁকেছেন মরণোত্তর জীবনের ছবি। এই অতিলৌকিক জগৎ বাস্তব জগতের মতো আলোকিত হতে পারে নি এবং তাঁর বস্তুনিষ্ঠার মাহাত্ম্য যেন কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে, এমন কথা কেউ কেউ মনে করেন।

বহু বিচিত্র ধরনের উপন্যাস বিভূতিভূষণ লিখেছেন। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪৩) উপন্যাস একেবারে আটপৌরে উপন্যাস। রানাঘাট স্টেশনে হাজারি ঠাকুরের এই হোটেল কী ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এই উপলক্ষে জীবনের সুখদুঃখের সাধারণ গল্প, অথচ অসাধারণ শক্তিশালী কলমে পরিস্ফুট। এইরকম সাধারণ পরিবারের গল্পই পাই 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১) উপন্যাসে। সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভূতিভূষণ লিখেছেন 'অনুবর্তন' (১৯৪২) উপন্যাস। আদর্শ শিক্ষাবিদের জীবন নিয়ে আশ্চর্য এই মানবিক সৃষ্টিকর্মটি ঈষৎ অপরিচিত হলেও এটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে। আরো অনেক উন্নতমানের উপন্যাস বিভূতিভূষণ লিখেছেন, সেগুলি বেশ কিছুটা

Scanned with CamScanner

জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে। তবে 'ইছামতী' (১৯৪৯) উপন্যাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিভূতিভূষণ কিশোরদের উপযোগী উপন্যাসেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিশেষত তাঁর 'চাঁদের পাহাড়' আজ পর্যন্ত একটি ধ্রুপদী কিশোর সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

২.৭ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

বাংলা কথাসাহিত্যের একজন নিষ্ঠ ও সচেতন শিল্পী হিসাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচিতি। উপন্যাস তিনি সংখ্যায় খুব বেশি লেখেন নি, কিন্তু অত্যন্ত অল্প বয়সেই তিনটি অসাধারণ উপন্যাস লিখে তিনি পাঠকদের চমৎকৃত করেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যের রোমান্টিক বাতাবরণ ছিন্ন করে তিনি যে বস্তুবাদী নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন, বাংলা কথাসাহিত্যে তা অভিনব, সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে অবশ্য মার্কসবাদে দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁর সৃষ্টিকর্মে এক লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। পূর্ববর্তী পর্বে তাঁর রচনাকর্মের সঙ্গে যথাস্থিতবাদী বা ন্যাচারালিস্ট সাহিত্যিকদের রচনায় সাদৃশ্য দেখা যেত, কিন্তু উত্তরপর্বে তিনি উদ্দেশ্যভিত্তিক সাহিত্যকর্মের প্রতি বেশি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। অবশ্য মহৎ সাহিত্যিক ছিলেন বলেই এতে তাঁর রচনাসৌকর্যের খুব বেশি তারতম্য ঘটেছে বলে আমরা মনে করি না, কিন্তু দুটি পর্বের রচনায় আস্বাদের পরিবর্তন যে ঘটেছে এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

২.৭.১ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

প্রথম আবির্ভাবেই সচকিত করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চারটি উপন্যাসের মাধ্যমে। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'জননী' এবং 'দিবারাত্রির কাব্য', ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি'। এর মধ্যে প্রথম দুটি উপন্যাসের মধ্যে 'জননী' আপাতদৃষ্টিতে সরল, কিন্তু 'দিবারাত্রির কাব্য' আদ্যন্ত সাঙ্কেতিক। জননী উপন্যাসে শ্যামা চরিত্র অবলম্বন করে দেখানো হয়েছে নারীর জীবনে জননী-স্তরটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি অবশ্য কোনো আদর্শায়িত ধারণা থেকে নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বর্ণিত। কিন্তু দিবারাত্রির কাব্য' বাংলা সাহিত্যে কেন, কোনো ভাষার সাহিত্যেই সুপ্রচুর রচিত হয় না। ভূমিকায় চরিত্রগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে লেখক বলেই দিয়েছেন—'চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection, মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।' কাহিনিবিভাগ এরকম উপন্যাসে কমই থাকে, তবু বলা যায় এর প্রধান চরিত্র চারটি—হেরম্ব-সুপ্রিয়া, অশোক ও আনন্দ। তিনভাগে বিভক্ত উপন্যাসের প্রথমভাগ দিনের 'কবিতা'-য় হেরম্ব-সুপ্রিয়ার প্রাক্-বিবাহ প্রেম সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত পুলিশের দারোগা অশোকের সঙ্গে সুপ্রিয়ার বিবাহ, পাঁচ বছর পরে সুপ্রিয়ার বিবাহ, হেরম্বর কাছে ফিরে আসার চেষ্টা কিন্তু উদাসীন। দ্বিতীয়ভাগ 'রাতের কবিতায়' স্বর্গীয় সুষমার মূর্তরূপ আনন্দর প্রতি হেরম্বর আকর্ষণ, নর্তকী আনন্দ ও হেরম্বর সম্পর্ক। তৃতীয়ভাগ 'দিবারাত্রির কাব্য' সুপ্রিয়ার ভালোবাসার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, হেরম্ব সুপ্রিয় ও আনন্দর মধ্যে কাকে ভালোবাসে এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত—অবসিতপ্রায় যৌবনে আনন্দের সঙ্গে মিলিত হওয়া যায় না, সুপ্রিয়ার বিদ্রোহেরও শরিক হওয়া অসম্ভব।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' সম্ভবত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। গাওদিয়া গ্রামের শশী শহর থেকে ডাক্তারি পাশ করে আসার পরে না পারে গ্রাম্য মানসিকতা মেনে নিতে, না পারে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যেতে। এই সঙ্গে মতি ও কুমুদের বৃত্তান্ত জুড়ে তৈরি হয়েছে এক আদর্শ উপন্যাস যেখানে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছের প্রায় কিছুই মূল্য নেই, আদর্শ নিয়তির হাতে মানুষ পুতুলের মতো নাচছে। 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে কুবেরও প্রায় সেইরকমই হোসেন মিয়ার হাতের পুতুল—যেন তার অলঙ্ঘ্য নির্দেশেই স্ত্রীকে ছেড়ে শ্যালিকা কপিলাকে নিয়ে ময়নাদ্বীপ চলে যেতে হয় তাকে।

প্রথম পর্বে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল 'অহিংসা', 'অমৃতস্য পুত্রা', 'সহরতলী',

Scanned with CamScanner

'চতুষ্কোণ' ও 'প্রতিবিম্ব'। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'সহরতলী' ও 'চতুষ্কোণ'। দু-খণ্ডে রচিত 'সহরতলী' উপন্যাসে সমাজের একেবারে নিম্নবিত্ত মানুষদের গল্প শুনিয়েছেন লেখক। মতি, সুধীর, ধনঞ্জয়, জগৎ, চাঁপা প্রভৃতি এই সমাজের মানুষ। যশোদা এবং সত্যপ্রিয় এই সমাজে নেতৃত্ব দিয়েছে। চরিত্রদুটি অসাধারণ দক্ষতায় অঙ্কিত ও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী অথচ পরিপূরক চরিত্র। 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসটি ফ্রয়েড দ্বারা প্রভাবিত মনে হয়। এর নায়ক রাজকুমার যৌন বিকারকে খুব স্বাভাবিক 'অ্যাকসিডেন্ট' হিসাবে গ্রহণ করে।

পরবর্তী সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেসব উপন্যাস রচনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জয়ন্তী' (১৯৪৮) এবং দু-খণ্ড সমাপ্ত 'সোনার চেয়ে দামী' (১৯৫১-৫২)।

Scanned with CamScanner